অভ ব্লাড, স্পার্ম এ্যান্ড টিয়ার্স

নাদিয়া ইসলাম

আরজেন্টিনিয়ান ডিরেক্টর গ্যাসপার নোয়ার 'লাভ' (২০১৫) আমি প্রথম দেখি প্রায় বছর দুয়েক আগে, জানুয়ারি মাসের এক ঠাণ্ডা রাতে। আমি তখন রিসার্চের কাজ নিয়ে বসনিয়ার সারিয়েভো শহরে। আর সারিয়েভো তখন জানুয়ারির চাইতেও বেশি বিষন্ন এবং ঠাণ্ডা। প্রায় দুই যুগ আগে শেষ হওয়া যুদ্ধের আফটারম্যাথে।

ঘরের বাইরে তখন তীব্র শোঁ শোঁ শব্দে তুষার ঝড় চলছে, ঘরের ভেতর আমি হিটিং অন করে লেপের নিচে শুয়ে শুয়ে ল্যাপটপে একের পর এক ফিল্ম বিঞ্জওয়াচ করে যাচ্ছি।

'এমিলি' দেখা শেষ হলে ভাবলাম এখন কী দেখা যায়।

এমিলি আমার খুব প্রিয় ফিল্ম। অসংখ্যবার এমিলি দেখেছি, আরও অসংখ্যবার এমিলি দেখা যেতে পারে; তাই একবার ভাবলাম এমিলির ভালো লাগার রেশ নিয়েই ঘুমাতে যাওয়া যাক। রাত তখন প্রায় তিনটা। নতুন কেনা একগাদা ফিল্মের সাথে 'লাভ' এর ডিভিডিটা আমার হাতে। ডিভিডির বাক্স উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে আমার মনে হলো, প্রেমের মত বস্তাপচা জিনিস নিয়ে এই যুগে কি কেউ ফিল্ম বানান? আর এই জিনিস কেনই বা আমি পয়সা দিয়ে কিনতে গেছি? তবে কেনা হলেও এই রাতে প্রেমের ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান, তুমি আমার- আমি তোমার জাতীয় ডায়লগ দিতে দিতে সোহাগের বাটিতে প্রেমের ছাতু মাখতে মাখতে 'উহু মরি রাগিণী' মার্কা গান গাওয়ার দৃশ্য দেখার কোনো কারণই থাকা উচিত না আমার।

কিন্তু কার্য এবং কারণের বাইরেও মানুষ কাজ করেন। আমিও করলাম। সংজ্ঞত কোনো কারণ ছাড়াই আমি 'লাভ' দেখা শুরু করলাম। এবং শুরুর সাথে সাথেই লাভের সাথে আটকে গেলাম আমি। আটকে যাওয়ার অবশ্য খুব সংজ্ঞত কারণ ছিল।

লাভের প্রথম দৃশ্য অসম্ভব ইরোটিক। ভোর হবে হবে এমন সকালে সম্পূর্ণ নগ্ন দুইজন মানুষ একটা চাদর কোঁচকানো এলোমেলো বিছানায় শুয়ে আছেন এবং একজন অন্যজনকে মাস্টারবেট করিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েটার হাত তার সঙ্গীর পুরুষাঙ্গে, খুব ধীর লয়ে সেই হাত উঠছে এবং নামছে। ছেলেটার হাতের দুই আঙ্গুল মেয়েটার যোনির ভেতরে, কিন্তু তার মুখে কোনো উত্তেজনা নাই। মেয়েটারও দুই চোখ বন্ধ। ডি মেজরে গামবার জন্য কয়েকটা সোনাটা লিখেছিলেন বাখ। নেদারল্যান্ডস বাখ সোসাইটির মিনেকে ভ্যান দার ভেলদেনের বাজানো ভিওলা দি গামবা- এনতোনি দেসপন্দ ১৬১৭ নামের সেই গামবার একটা ভিডিও আছে

ইউটিউবে। বাখ চোখ বন্ধ করে শোনার জিনিস হলেও এই ভিডিওটা দেখার মত একটা জিনিস। মিস ভ্যান দার ভেলদেন চেয়ারে বসে চেলো বাজাচ্ছেন। হার্পসিকর্ডে আছেন বেনইয়ামিন এ্যালার্দ। স্ট্রিং আর কিতে জানুয়ারির তুষার ঝড় উঠছে, বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দে নিম্নচাপের ভয়েড তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মিস ভ্যান দার ভেলদেনের মুখ অস্বাভাবিক শান্ত। যেন তার হাতের সাথে মুখের সম্পর্ক নাই। যেন তার হাত অদৃশ্য অন্য কেউ চালাচ্ছেন। যেন তার হাত অন্য কারুর।

লাভের প্রথম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার ভ্যান দার ভেলদেনের চেলো বাজানোর কথা মনে হল।

গ্যাসপার নোয়া এই ফিল্মে যৌনতার ভেতর দিয়ে প্রেমের গল্প বলেছেন। যেটাকে হয়তো সেন্টিমেন্টাল সেক্সুয়ালিটি বলা যায়। কাজটা সহজ না। পর্নোগ্রাফিক আর ইরোটিক- এই দুই শব্দের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। লাভ পর্নোগ্রাফিক ফিল্ম না। অনেকটা স্বপ্নদৃশ্যের ভেতর দিয়ে একগাদা টাইমলাইনে লাফাতে লাফাতে যাওয়া আমাদের সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিময় জটিল মনস্তত্ব আর বাস্তবতার ভেতর ঘুরপাক খাওয়া হাইলি ইরোটিক একটা গল্প এটা।

গল্পের প্রধান চরিত্র মারফি (কার্ল গ্লাসম্যান)- আমেরিকান চলচ্চিত্র নিয়ে পড়ালেখা করতে প্যারিসে এসেছেন। স্কুলের এক অনুষ্ঠানে একটা পার্কে তার পরিচয় হয় ইলেক্ট্রা (এওমি মিওক)-এর সাথে। পরিচয়ের প্রায় সাথে সাথেই একটা যৌনতার- এবং সেই থেকে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তাদের মধ্যে। একদিন বিছানায় মারফি ইলেক্ট্রাকে জিজ্ঞেস করেন, তার সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি কী। ইলেক্ট্রা উত্তর দেন- থ্রিসাম - বিছানায় তাদের দু'জনের সাথে অন্য একজন মেয়ের উপস্থিতি।

এন্টার- অমি (ক্লারা ক্রিস্টিন)। পাশের বাসার ব্লন্ড টিনএইজ প্রতিবেশী। কিন্তু একরাতের থ্রিসামের ফ্যান্টাসি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ইলেক্ট্রার অনুপস্থিতিতে এক পারিসিয় দুপুরবেলায় মারফির সাথে অমির যৌন সম্পর্ক হয় এবং কনডম ছিঁড়ে যাওয়ার আফটারম্যাথে সেদিনই অমি প্রেগনেন্ট হয়ে পড়েন।

গল্পটা শুরু হয় দ্বিতীয় দৃশ্য দ্বিতীয় টাইমলাইন থেকে। বাচ্চার কান্নার শব্দে মারফি ঘুম থেকে উঠছেন, তার পাশে তখনো ঘুমাচ্ছেন এলোমেলো সোনালী চুলের হ্যাংলা পাতলা একজন মেয়ে। মারফি মনোটোনাস ডিপ্রেসড গলায় বিড়বিড় করতে করতে নিজেকে এবং পাশের মেয়েটাকে গালি দিয়ে অসম্ভব বিরক্ত ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে পাশের ঘরে ক্রিবের ভেতর থেকে বাচ্চাকে কোলে নিলেন। অমি ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছেন। মারফি তার হাতে বাচ্চা দিয়ে ফোনে মেসেজ চেক করতে গিয়ে একটা ভয়েসমেইল পান। ভয়েসমেইল পাঠিয়েছেন ইলেক্ট্রার মা। তিনি গত তিন মাস ধরে ইলেক্ট্রাকে খুঁজে পাচ্ছেন না।

না, আমি কোনো স্পয়লার দিচ্ছি না। অবশ্য গল্প হিসাবে দেখতে গেলে এখানে স্পয়লার দেয়ার মত তেমন কোনো জটিল গল্প নাই। মারফি এবং ইলেক্ট্রার সম্পর্কটা প্রাথমিকভাবে ভাঙে অমি প্রেগনেন্ট হয়ে যাওয়ার

কারণে। এরপর তারা অন-এ্যান্ড-অফভাবে সম্পর্ক চালান, সেই সময় মারফি ইলেক্ট্রাকে সন্দেহ করা শুরু করেন এবং নিজেই একাধিক মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক শুরু করেন, গ্রুপ সেক্সে যুক্ত হন। সবশেষে প্রো-লাইফ অমির প্রেগনেন্সি টারমিনেট না করার ফলশ্রুতিতে তিনি অমিকে বিয়েও করেন। কিন্তু শুধুমাত্র এই গল্প দিয়ে এই ফিল্মকে বোঝা সম্ভব না। শট ডিভিশনের মত জটিল বিষয় আমার কাপ-অফ-টি নয়, ঐদিকে আমি যাবোও না। তবে শুধু যদি সিনেম্যাটোগ্রাফির কথাই বলা হয়, তাহলেও শব্দ দিয়ে এই ফিল্ম ব্যখ্যা করা যাবে না। ফিল্মের প্রতিটা দৃশ্যে আলো এবং রঙের ব্যবহার খুব সিম্বলিকভাবে পাল্টাচ্ছে, রিভার্স ক্রনোলজির ফ্লাশব্যাক আর স্মৃতির ব্লাক-আউট কাটে মাকড়শার জালের মত ক্যালিডোস্কোপের ভেতর দিয়ে গল্পটা প্যাঁচ খাচ্ছে, একই সাথে আপনি সেক্সুয়ালি উত্তেজিত হচ্ছেন এবং পরমূহুর্তেই বিষন্ন হয়ে পড়ছেন। অথচ তার কারণ বের করতে পারছেন না।

মারফির চরিত্র অপছন্দ করার মত একটা চরিত্র। ঈর্ষাকাতর অসৎ দায়িত্বজ্ঞানহীন একজন মানুষ, হয়তো খানিক কম বুদ্ধিরও। কিন্তু তাকে ঠিক অপছন্দও করা যায় না। সম্ভবতঃ তার ভেতরে আমরা নিজেকে দেখতে পাই বলে। সম্ভবতঃ আমাদের মূহুর্তের উত্তেজনা মারফির মতই আমাদের সম্ভাবনাময় সম্পর্ক এবং এমনকি আমাদের জীবনকেও নষ্ট করে দেবার সম্ভাবনা রাখে বলে মারফির প্রতি এক ধরণের করুণা তৈরি হয় আমাদের। আমাদের একজিস্টেনশিয়াল ডিলেমা মারফির ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায় বলে হয়তো এক ধরণের মমত্ববোধও কাজ করে তার প্রতি।

প্রেম বিষয়ে আমার ধারণা স্পষ্ট না। প্রেমকে কোনো কোনো সময় আমার একপাক্ষিক ঈশ্বর সাধনার মত গোপন অকাল্ট বিষয় বলে মনে হয়, মনে হয়, নিজের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের কাল্পনিক ধারণাকে মূর্ত করা বা অন্যের আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে নিজের ভেতর ঈশ্বরকে জন্ম দেয়ার নাম প্রেম, মনে হয় প্রেম শুধুমাত্রই সৃষ্টিশীলতার আরেক নাম, আবার মনে হয় এইসব নিওরোট্রান্সমিশানের এইসব হরমোন গোলযোগের পুরুষতান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার ভেতর বনবন পাঁক খাওয়ার বংশগতি রক্ষার এভোলুশনারি কালেক্টিভ আনকনশাসনেসেরই তা এক ভয়ংকর অপ্রতিরোধ্য সিস্টেমের নাম। তবে বায়োলজি হোক, এভোলুশান হোক, আর স্পিরিচুয়াল সার্চ হোক- প্রেম আমার কাছে ব্যক্তিগত দুঃখের মত খুবই একপাক্ষিক, গোপন। সম্পর্ক- অন দি আদার হ্যান্ড- দ্বিপাক্ষিক বিষয়। আর এই সম্পর্ক তৈরি করতে গিয়ে, সম্পর্কের প্যারামিটার তৈরি করতে গিয়ে, সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে আমরা, মানুষরা খুব প্যাঁচ খেয়ে যাই। মানুষ স্বভাবতই খুব কমপ্লেক্স প্রাণী, আমাদের বসবাস মাল্টি ডিমেনশানের মাল্টি লেয়ারে, সরলতা এমনকি আমাদের মধ্যে সরলতম মানুষেরও বৈশিষ্ট্য না। আমাদের মধ্যে কনট্রাডিকশান আছে, ডিলেমা আছে, আনপ্রেডিকটেবিলিটি আছে। আমরা একইসাথে বহু আদর্শ ধারণ করি এবং তা করি বলেই আমরা কেউই আদর্শবাদী না, অথচ আমরা নিজেদের আদর্শবাদী বলে ভাবতে ভালোবাসি। আমাদের নিজস্ব একটা চরিত্র নাই, আমরা একইসাথে বহু চরিত্র ধারণ করি, কিন্তু নিজেদের একটা চরিত্র বলে ভাবতে ভালোবাসি। আমাদের মধ্যে একইসাথে ভালো খারাপ এবং তার মধ্যবর্তী ফিফটি শেইডস অভ গ্রের সমন্বয় আছে, অথচ আমরা নিজেদের আইডেন্টিফাই করি ভালো বা খারাপ মানুষ হিসাবে। আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিচিতি নাই, অথচ আমরা নিজেদের দেখি কবি বা লেখক বা ডাক্তার বা এনজিনিয়ার বা হিন্দু বা মুসলমান বা বাঙালী বা ইংরেজ হিসাবে। নারী বা পুরুষ হিসাবে।

মারফি এবং ইলেক্ট্রার সম্পর্কটা আমাদের সেইসব কনট্রাডিকশান, সেইসব ডিলেমা, সেইসব আনপ্রেডিকটেবিলিটিরই যোগফল। আমরা যা চাই, তা আমরা আদৌ চাই কিনা, আমরা যা ভালোবাসি, তা আদৌ ভালোবাসি কিনা, আমরা যা করি, তা আদৌ করতে চাই কিনা- এমন সবকিছুর কনফিউজড একটা মেইজই আমাদের সম্পর্কগুলিকে রিপ্রেজেন্ট করে। আমরা নিজেদের যতই প্রগতিশীল বলে দাবী করি না কেন, দিনশেষে আমাদের ভেতর পুরুষতান্ত্রিক ঈর্ষা ঢুকে পড়ে, নিজেদের যতই স্বাধীন ভাবি না কেন, দিনশেষে আমরা নিজেদের অন্যজনের সামনে পরাজিত দেখতে চাই, আমরা যতই উত্তরাধুনিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকি না কেন, দিনশেষে আমরা পুরুষতান্ত্রিক প্রাচীন নিয়মে অন্যকে বাঁধতে চাই, তাদের নিজের সম্পত্তি বলে দেখতে চাই এবং এই দ্বৈত (ইফ নট মোর) চরিত্রর টানাপোড়নে দিনশেষে আমরা জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলি। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বাসনা থেকে যেই প্রেমের উৎপত্তি, দিনশেষে সম্পর্কের ভেতর দিয়ে আমরা নিজেকেও হারিয়ে ফেলি। তাই হয়তো এক সম্পর্ক শেষ করে, এক সম্পর্ককে মাঝ রাস্তায় ঝুলিয়ে আবার নতুন কোনো প্রেমে নিজেকে খোঁজার মিশন চলতে থাকে আমাদের। তাই হয়তো আমরা আবার নতুন নতুন প্রেমে পড়ি প্রতিদিন। হয়তো সেই প্রেম প্রেমিকা থেকে সরে গিয়ে নতুন পড়া বইয়ের ভেতর, নতুন দেখা ফিল্মের ভেতর, বাথটাবের পানিতে সন্তানের কান্নার ভেতর দিয়ে ফিরে আসে।

লাভের শেষ দৃশ্যগুলি দেখলেই সেটা টের পাওয়া যায়। হয়তো আপাত অর্থে সন্তানের কাছে মারফির প্রেমিকার পরাজয় হয়, হয়তো এই দৃশ্যকে জীবনের সাথে কম্প্রোমাইজ বলে মনে হয়, প্রেমকে সাক্রেফাইস করা হয় বলে মনে হয়, কিন্তু হয়তো মারফি নিজেই জানেন না তার কাছে প্রেম কী। ডিজনির পোকাহনটাস ফিল্মে আমার খুব প্রিয় একটা গান আছে। গানের একটা লাইন, যেটা মূলতঃ হেরাক্লিটাসের একটা কথা, সেটা এরকম, “ইউ নেভার স্টেপ ইন দা সেইম রিভার টোয়াইস”- আপনি এক নদীতে দুইবার পা ফেলতে পারবেন না। কারণ নদী সবসময়ই বদলাচ্ছে। প্রেমকেও সেইরকম মনে হয় আমার। এক প্রেমে দুইবার পড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব না। কারণ প্রতিটা মানুষ প্রতি মূহুর্তে বদলাচ্ছে। এমনকি খুব চেনা মানুষও আর ঠিক আগের মানুষ নাই। আর তাই তার সাথে প্রেমও আর ঠিক আগের জায়গায় নাই। আর যদি তা নাই থাকে, তাহলে এই প্রেমের থাকা বা না থাকাটাও আর থাকা না থাকা হয় না। হয়তো প্রেম আগেই অন্যত্র চলে গেছে, আপনি টের পাচ্ছেন না।

মারফি একদিন এক পার্টিতে মাতাল অবস্থায় ইলেক্ট্রাকে বলেন, "আই ওয়ান্ট টু মেক মুভিস অভ ব্লাড, স্পার্ম এ্যান্ড টিয়ার্স"। সম্ভবতঃ মারফির মুখ দিয়ে এটা স্ক্রিপ্টরাইটার পরিচালকেরই অকৃত্রিম নগ্ন বক্তব্য। আর গ্যাসপার নোয়ার ভুল নাই এইক্ষেত্রে, কারণ রক্ত, বীর্য আর কান্নার মত আমাদের শারীরিক তরল দিয়েই সম্ভবতঃ খুব ক্রুড লেভেলে আমাদের আদিম মনস্তত্বকে ধারণ করা যায়। আমাদের আধুনিক চামড়ার আধুনিক এপিডার্মিসের গভীর তলদেশ দিয়ে যে প্রাচীন মানুষের বাহ্যিক চাহিদা আর দৈনন্দিন প্রাপ্তি আর বেঁচে থাকার ভয়ের খুব ইহলৌকিক র' জীবনের রক্ত চলাচল করে, তা বাদ দিলে মানুষ হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু একইসাথে আমরা আদিম সমাজে বিলংও করি না। তবে আমাদের এই বোঝা না বোঝার, আদিম বনাম আধুনিক মনস্তত্বকে সম্ভবতঃ হেগেলই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একজন মানুষই আমাকে বুঝতে পারেন। এবং তিনিও আমাকে বোঝেন না।" এই মারফি-ইলেক্ট্রা চরিত্রের, তাদের প্রেমের এবং তাদের সম্পর্কের এই গল্প, যতই উত্তরাধুনিক হোক না কেন, আপনার আমার কাছে তা যতই সামাজিক বিচারে ত্যজ্য বলে মনে হোক না কেন, মনোবিজ্ঞানের হিসাবে তা যতই বিধ্বংসী হোক না কেন, এই সম্পর্কগুলি আমাদের আদিম-আধুনিক দ্বৈত চরিত্রের বোঝা না বোঝার সংকটকেই সিনেম্যাটোগ্রাফার বেনোয়া ডেবির অদ্ভুত ক্যামেরার কাজের মধ্য দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে।

আর্থার শ্নিৎয্লারের ১৯২৫ সালে লেখা 'ত্রাওমনোভিল' (ড্রিম স্টোরি)-এর উপর ভিত্তি করে কুবরিকের 'আইজ ওয়াইড শাট' ফিল্মের সাথে লাভের অনেকগুলি জায়গায় মিল আছে। কুবরিকের মত ডিরেক্টরের কাছ থেকে আসার কারণেই কিনা জানি না, আইজ ওয়াইড শাটকে আমার বিরক্তিকরভাবে প্রাচীন চিন্তার আন্ডারওয়েলমিং কাজ বলে মনে হয়, তবে এই দুই হাইলি ইরোটিক ফিল্মই আমাদের মনের আদিম 'ডার্কার' সাইড নিয়ে কাজ করেছে। এই দুই ফিল্মেই আমি গুস্তাভ ক্লিমটের আর্ট নোভুর সিম্বোলিজম এবং ইন্সপিরেশান দেখি। আইজ ওয়াইড শাটে দেখা যায়, ডক্টর বিল হার্ফোর্ড (টম ক্রুজ) কেপ কডের হলিডেতে একজন নেভাল অফিসারকে নিয়ে তার স্ত্রী এ্যালিস (নিকোল কিডম্যান)-এর সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির গল্প শুনে ঈর্ষায় কাতর হয়ে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একলা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং স্ত্রীকে শাস্তি দেবার জন্য নাকি রাগে নাকি ঈর্ষায় প্রস্টিটিউটের বাসায় যাচ্ছেন, সেক্সুয়াল অর্জিতে যুক্ত হতে চাচ্ছেন। মারফি এবং বিল এই দুই চরিত্রই (বেশিরভাগ পুরুষের মত) তাদের নারী সঙ্গীর অভ্যন্তরের জগত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ফ্যান্টাসি এবং বাস্তবকে নারীরা মোটাদাগে যেভাবে আলাদা করে দেখেন, বেশিরভাগ পুরুষ সেই জায়গায় এসে লেজেগোবরে করে ফেলেন।

পৃথিবীর তাবত প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার সম্ভবতঃ 'লাভ ইউ' জাতীয় কথার পরেই সবচাইতে কমন ডায়লগ হচ্ছে, "তুমি আমাকে বোঝো না"। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, মানুষ তার সবগুলি জীবন জোড়া দিয়েও নিজেকেই নিজে বুঝে উঠতে পারেন না, অন্যকে বোঝা তার জন্য দূর কি বাত। কিন্তু তারপরেও আমাদের চাহিদা থাকে বিশেষ একজনের কাছে বোধগম্য হতে। সামাজিক বিচারে মারফি আর ইলেক্ট্রার চরম উশৃংখল সম্পর্কের ভেতরেও যে ইলেক্ট্রার প্রেমের অদ্ভুত ইনোসেন্স কাজ করে, সেটা মারফি কেন বুঝতে পারেন না ভেবে আমি আশ্চর্য্য হই। ভাবি, আশেপাশের লো ই-কিউয়ের ভিরে একজন মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা অন্যায় কিনা? তবে অন্যায় যদি নাও হয়, আমার মনে হয়, সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা একটা বিড়ম্বনা তো অবশ্যই। আর সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি সূক্ষ্ম চিন্তার শিল্পী আর লেখক আর দার্শণিকের মধ্যেও পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা নাই। আপনি একজন অঁরি মাতিস একজন রামকিংকরের সাথে সারাজীবন কাটানোর পর একদিন টের পেলেন, তিনি আপনার প্রিয় রঙ কী তাই জানেন না।

তবে প্রিয় রঙ না জানলে কি প্রেম থাকে না? হয়তো থাকে। হয়তো থাকে না। হয়তো প্রিয় রঙের উপর প্রেম নির্ভর করে না। হয়তো প্রিয় রঙের 'উপরেই' প্রেম নির্ভর করে। আনাইস নিন লিখেছিলেন, "একজন পুরুষ কখনো একজন নারীর একাকীত্ব টের পান না। পুরুষ নারীর গর্ভ থেকে শক্তি সঞ্চয় করেন, এই একীভূত

মিশ্রণ থেকে তিনি পুষ্টি পান, এরপর তিনি উঠে দাঁড়ান, পৃথিবীতে প্রবেশ করেন, কাজে ঢোকেন, যুদ্ধে যান, শিল্প সৃষ্টি করেন। তিনি একা নন। তিনি ব্যস্ত। গর্ভের তরলে সাঁতারের স্মৃতি তাকে শক্তি এবং সামর্থ্য দেয়। নারীও ব্যস্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি শূন্যতা অনুভব করেন। তার জন্য সংবেনশীলতা শুধু সুখানুভূতির ঢেউয়ে স্নান করা নয়, তা একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকা বিদ্যুত তরঙ্গের মত আনন্দ। যখন পুরুষ নারীর গর্ভে থাকেন, নারী পরিপূর্ণতা পান, প্রেমের প্রতিটা অনুষঙ্গে তিনি পুরুষকে বহন করেন, বহন করেন প্রতিটা জন্মে ও পুনর্জন্মে, শিশু পালন এবং পুরুষকে ধারণের ভেতর দিয়ে। অপরদিকে পুরুষ তার গর্ভে থেকে প্রতিবার পুনর্জন্ম নেন কর্মের আকাঙ্খায়, 'হবার' ইচ্ছায়। কিন্তু নারীর জন্য চূড়ান্ত আনন্দ জন্ম দেয়া নয়, বরং চূড়ান্ত আনন্দ সেই মূহুর্ত, যখন একজন পুরুষ তার ভেতরে বাস করেন।"

সেক্সুয়ালিটিকে দেখার দাতা-গ্রহীতার পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজের তৈরি 'রিপ্রেসিভ হাইপোথেসিস' জাতীয় প্রাচীন মতবাদ বাদ দিলে আধুনিক পৃথিবীতে নারী পুরুষের 'আপাত' সমতার পরেও যৌনতার ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা এবং আনন্দের প্রশ্নে নারী এবং পুরুষ মনস্তত্ব আলাদা, তা বুঝতে আমাদের রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। ফুকো দেখিয়েছেন কিভাবে ক্ষমতা আধিপত্য বিস্তার, দমন পীড়ন এবং অধীনস্ত রাখার মাধ্যমে বশ্যতা দাবী করে। এবং সেই ক্ষমতার উৎস সবজায়গাতেই, শুধু রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় বা সামাজিক আইনের ভেতর না, তার উৎস নারী পুরুষের সম্পর্কের ভেতরেও। কিন্তু যেই নারী ক্ষমতাধর, যিনি তার শরীর এবং চিন্তায় শক্তিশালী, যিনি আত্মনির্ভরশীল, যিনি তার সৌন্দর্য্য এবং যৌনতা পুরুষতান্ত্রিক সংজ্ঞায় না মেপেই সন্তুষ্ট, তাকে গ্রহণ করা পুরুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। গ্রিক বা আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের মিথোলজিগুলো থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ইলেক্ট্রা শক্তিশালী চরিত্র। তিনি দীর্ঘাঙ্গী, তার গায়ের রঙ তামাটে, কুচকুচে কালো চুল, দুই দাঁতের মাঝের যৌন উদ্দীপক ফাঁক, চোখের উপর মোটা ফ্রেমের চশমা সহ তিনি গোবিন্দদাসের রাধা বা কৃত্তিবাসের সীতা বা কাশীরামের দ্রৌপদীসহ পৌরাণিক নায়িকাদের মত যৌন আবেদনময়ী, একটা বুনো, জেদী, উগ্র, অদমনীয়, নির্লজ্জের মত কামাচারী শক্তি তার শরীরে। এমনকি তার দুর্বলতাও তার শক্তির অংশ। কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, মারফি তাকে ধরে রাখতে পারেন না। যৌনতার দৃষ্টিতে অমি যতই অনুত্তেজক ধ্যাদ্দারা হন না কেন, মারফি তার সাথেই জীবন কাটান, জীবন কাটাতে বাধ্য হন। ইলেক্ট্রার সাথে তার সম্পর্ক শুধু ফ্যান্টাসিতে থেকে যায়। তার কারণ কিন্তু শুধুমাত্র দুর্দমনীয় নারী শক্তিকে ভয় পাওয়া নয়, তার কারণ এই শক্তির পাশে তার দুর্বলতাকে- তার সূক্ষ্ম অনুভূতি- তার সংবেদনশীলতাকে বুঝতে না পারার ক্ষমতার অভাব। হ্যাঁ, হাত কেটে গেলে সবাই তারস্বরে চেঁচান না অবশ্যই, কিন্তু তার অর্থ তো ব্যথা না পাওয়া নয়। ব্যথা সকলেই পান, সকলের হাত থেকেই রক্ত পড়ে, কিন্তু সবাই সেই দুর্বলতা প্রকাশ করেন না। তার অর্থ তো এই না যে তার দুর্বলতা নাই।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা শক্তিশালী নারীদের দেখি। কিন্তু শক্তিশালী নারীর নারীশক্তি হজম করার মত, তাকে ধারণ করার মত, তাকে অনুধাবন করার মত, আত্মস্থ করার মত, উদযাপন করার মত, তাকে যে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি- এমন শক্তিশালী পুরুষকে কি আমরা দেখি?

তাই ইলেক্ট্রারা হারিয়ে যান। মারফিরা সাময়িক সময়ের জন্য তাদের কাছে পান, কিন্তু কোনোদিনই তাদের ধরে রাখতে পারেন না।

ইলেক্ট্রাদের প্রেমের স্থানান্তর ঘটে মারফিদের আঠারো মাসের শিশুপুত্রদের ভেতরে।

আলোকচিত্র সূত্রঃ নেটফ্লিক্স

Copyright © 2020 Nadia Islam, Published 31st Dec, 2020.

নাদিয়া ইসলাম-এর (জন্ম ১৯৮৫) পড়াশুনা ফ্যাশন ডিজাইন, অপরাধ বিজ্ঞান ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে। নারীবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, ভেগান ও বিড়ালপ্রেমী। উপন্যাস ও গল্প লেখক। এছাড়াও বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় নারীবাদ বিষয়ে এবং সমাজ-রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করেন।